বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-জুন। সাল-২০২৬

'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার
১ মাস পূর্ণ করল পশ্চিমবঙ্গে

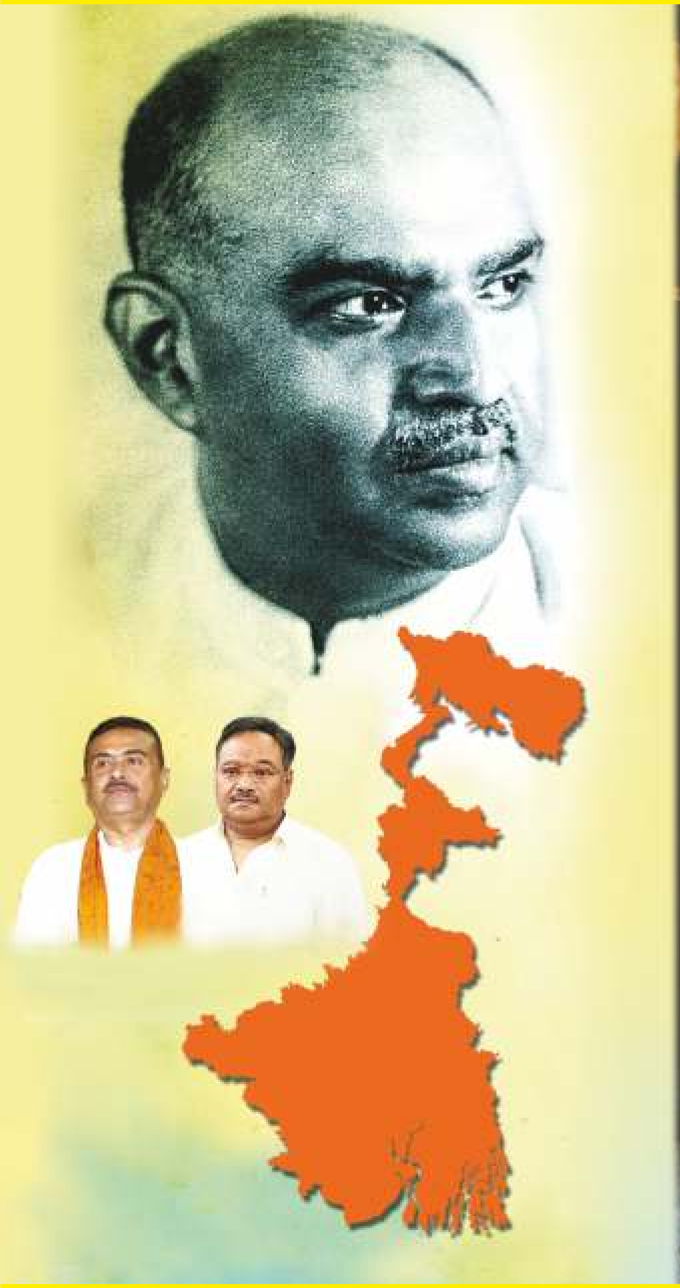

প্রথমবার সরকারী স্বীকৃতি পেল পশ্চিমবঙ্গ দিবস

শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৪,৩৯৯ দিন-শুধু সময়ের হিসাব নয়,
এক নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস, উন্নয়ন ও গৌরবের যাত্রাপথ।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জুন সংখ্যা। ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তারকেশ্বর সম্মেলন ৪
অধ্যাপক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নের মন্ত্রিসভা, সর্বসাধারণের মন্ত্রিসভা ১০
অভিরূপ ঘোষ

ডাবল ইঞ্জিনের ধাক্কায় এক মাসেই রাজ্যে বসন্ত বাতাস ১২
জয়ন্ত গুহ

পশ্চিমবঙ্গে রেলের অগ্রগতি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের চাক্ষুষ প্রমাণ ১৫
সৌভিক দত্ত

ছবিতে খবর ১৮

অনন্য ব্যক্তিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ২৪
দিব্যেন্দু দালাল

রাজ্যে চালু হল অন্নপূর্ণা ভান্ডার কথা রাখলো বিজেপি সরকার ২৭
সোমনাথ গোস্বামী

ককরোচ জনতা পার্টি: ডিপ স্টেটের আরেকটি চাল ৩০
গৌতম ঘোষ

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃত্বে ১২ বছর। সেবার ১২ বছর। সংকল্পের ১২ বছর। উন্নয়নের ১২ বছর।

গ্রামাঞ্চলে যাঁদের নিজস্ব পাকা বাড়ি নেই তাঁদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ১২ বছর। আস্থার ১২ বছর।

কেবলমাত্র খাদ্য সুরক্ষা নয় বরং পুষ্টির মান বৃদ্ধি করতে এবং গরিব মানুষের ওপর থেকে আর্থিক চাপ কমাতে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার ১২ বছর। সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির ১২ বছর।

ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নের এক আমূল রূপান্তরের ১২ বছর। স্বপ্নের উড়ানের ১২ বছর। নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে ভারতে পরিকাঠামো খাতে বার্ষিক বরাদ্দ ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.২২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। জাতীয় সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে রেকর্ড অগ্রগতি, বন্দে ভারত ও অমৃত ভারতের মতো আধুনিক ট্রেনের সংযোজন এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে গতি এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

মাথা নীচু করে নয়। মাথা উঁচু করে বাঁচার ১২ বছর। নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১২ বছর আসলে কংগ্রেস আমলের ঝুঁকে চলা ইন্ডিয়া থেকে তেজী নতুন ভারতের উত্থানের ১২ বছর।

দেশের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক গর্বের যাত্রাপথের ১২ বছর। 'অন্ত্যোদয় থেকে রাষ্ট্রোদয়'-এর আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ১২ বছর। নরেন্দ্র মোদীর কথায়, "১২ বছরে যদি এত সাফল্য পাওয়া যায়, এর আগের দশকগুলিতে সেগুলো হল না কেন? এটাই কংগ্রেস আমলের উন্নয়নের সঙ্গে এনডিএ আমলের উন্নয়নের ফারাক। প্রথমটা মানুষকে অপেক্ষা করাত। দ্বিতীয়টা কাজ করে দেখায়। কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে দেশকে মুক্ত করাই গত ১২ বছরে এনডিএ-র অন্যতম বড় সাফল্য। এখন দেশের প্রত্যেক নাগরিক বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেন। এটা আর কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।''

নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়নের সুফল গত ১২ বছরে সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কাছেও পৌঁছেছে এবং আত্মনির্ভর, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

গরিব, বঞ্চিত, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষমতায়ন, সুশাসনের প্রসার এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণে ১২ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ পরিবার ঐক্যবদ্ধভাবে পূর্ণ নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। উন্নয়ন, সেবা ও সুশাসনের এই পথচলাকে নিয়ে যেতে হবে বহুদূর। দেশের ১৪০ কোটিরও বেশি নাগরিকের জন্য সেই পথচলা।

অবিরাম সেই যাত্রাপথের নাম নরেন্দ্র মোদী। গত ১২ বছরে প্রতিদিন যে যাত্রাপথ সবার সঙ্গে সবার বিকাশের মন্ত্রে তৈরি করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তারকেশ্বর সম্মেলন

অধ্যাপক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কলকাতা হল ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। কিন্তু এটাই হতে পারত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। তখনকার কলকাতা আর এখনকার কলকাতায় বিস্তর ফারাক। তখন কলকাতা ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে এশিয়ার সবথেকে সমৃদ্ধশালী শহর; বর্তমানের অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব কলকাতার সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। তো এহেন কলকাতার প্রতি জিন্নাহ-র ছিল বরাবরের লোভ। বিশেষত ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর কংগ্রেসি নেতৃত্বের অপদার্থতার ফলে অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জিন্নাহ, সুহরাওয়ার্দিসহ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কলকাতাসহ সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার উদগ্র বাসনা বৃদ্ধি পায়। বিখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁর আত্মজীবনী 'আট দশক'-এ লিখছেন, তিনি যখন ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানের মৌলানা আজাদ কলেজ) পড়াচ্ছিলেন, তখন তাদের ভারত বা পাকিস্তান অপশন নিতে বলা হয়। তাঁর মুসলমান সহকর্মীরা সবাই লেখেন, "পাকিস্তান, প্রেফারেবলি ক্যালকাটা"। তাঁর এক মুসলিম সহকর্মী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "হাওড়া তো আপনাদেরই থাকছে।" অর্থাৎ দেশভাগ হওয়ার কিছু আগেও কলকাতা পাকিস্তানে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল মুসলিম লীগ। এই পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকরণের স্বপ্নের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ান একজন ব্যক্তি- তাঁর নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

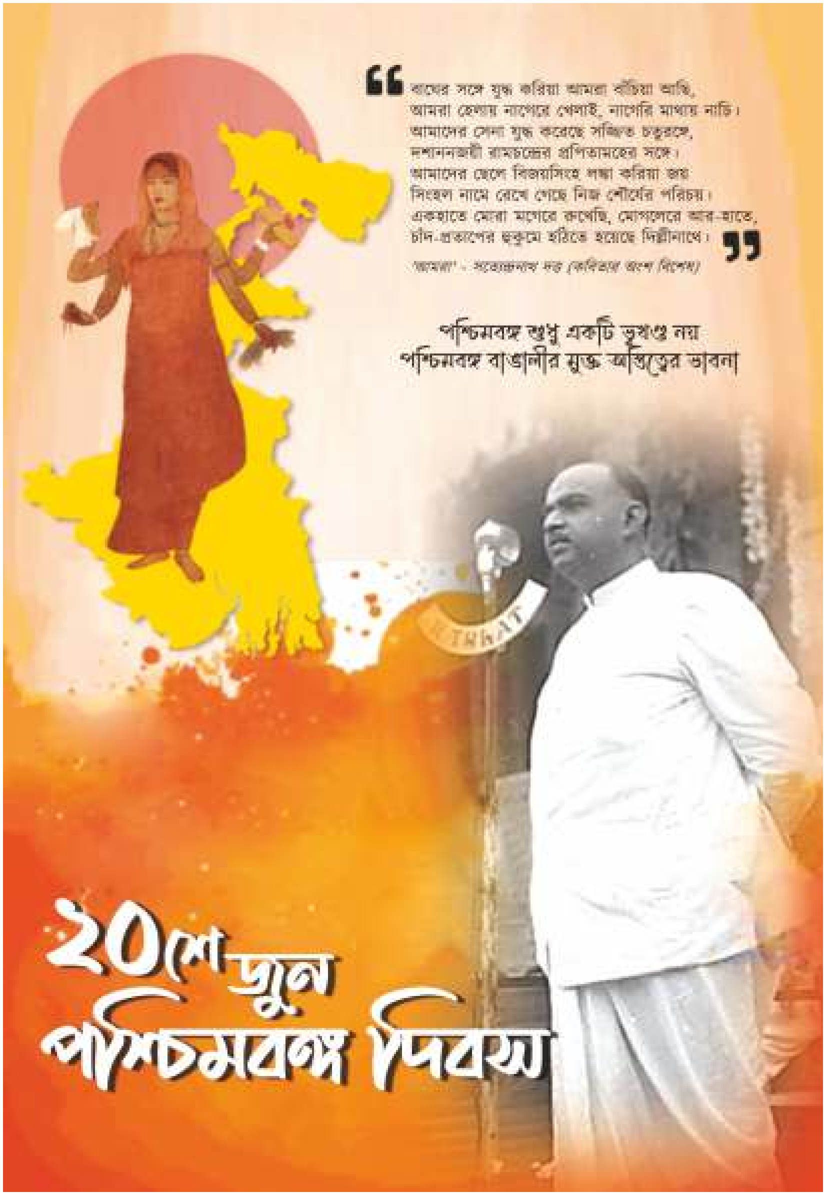

জিন্নাহ-র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ১৯৪৬-এর ১৬ই অগাস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ('Direct Action')-এর ডাক দেয়। তদানীন্তন অখণ্ড বঙ্গের 'প্রধানমন্ত্রী' (প্রিমিয়ার) সুহরাওয়ার্দি-র পূর্ববর্তী পরিকল্পনামাফিক ঐ দিন কলকাতায় হিন্দু নরমেধ যজ্ঞ আয়োজিত হয়। সুহরাওয়ার্দি নিজে লালবাজারে বসে থেকে সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সমস্ত হিসাব বানচাল করে দিয়ে হিন্দুরা ১৮ ও ১৯-এ

অগাস্ট ভয়ংকর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে ১০ হাজারের ওপর মানুষ মারা যান। মুসলিম লীগ আরেকটি হিন্দু গণহত্যার পরিকল্পনা করে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায়। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন এই জেলার হিন্দুদের ওপর (মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮%) এক ভয়াবহ বিভীষিকা নামিয়ে আনে মৌলানা গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে মুসলিম গুন্ডারা। সপ্তাহ খানেক ধরে চলা এই এথনিক ক্লিনজিং-এ ১০ হাজারের ওপর হিন্দু মারা যান। এছাড়া লক্ষাধিক হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরণ করা হয় এবং লক্ষাধিক হিন্দু নারী ধর্ষিতা, অপহৃতা হন। এসব দেখে তদানীন্তন বাঙ্গালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বুঝেছিলেন যে সমগ্র বাংলা যদি পাকিস্তানে যায় তাহলে বাঙ্গালী হিন্দুদের কী পরিণতি হতে পারে! বিশেষত দুই বাংলা মিলিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুরা যখন সংখ্যালঘু। ১৯৪১-এর জনগণনা অনুযায়ী অবিভক্ত বঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৪৫%। বর্তমানে অবশ্য এটি ৩০%-এরও নীচে নেমে গেছে- যাক গে, সে অন্য প্রসঙ্গ। এই অবস্থায় বাঙ্গালী হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করতে ময়দানে নামলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন ভারতবর্ষ যখন ভাগ হচ্ছেই তখন বঙ্গপ্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতাঃ"- এই প্রবাদবাক্য মেনে নিয়ে তিনি ময়দানে নামলেন বাঙ্গালী হিন্দু জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করতে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ তদানীন্তন বাংলার প্রধান বুদ্ধিজীবীরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে বাংলা ভাগ করে বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য পৃথক হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবীতে এগিয়ে আসেন।

অন্যদিকে এইসময় সুহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে চলছিল অন্য খেলা। সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব বুঝে মুসলিম লীগ নেতা কট্টর ধর্মান্ধ সুহরাওয়ার্দি হঠাৎ বাঙ্গালী-র ভেক ধারণ করলেন। তিনি বললেন- দুই বাংলা নিয়ে অখণ্ড বঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক- যা কিনা ভারত-পাকিস্তান কোন পক্ষেই যোগদান করবে না। কিন্তু অখণ্ড বাংলাতেও বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যালঘু হত। জিন্নাহও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে হয়ত এই অখণ্ড বঙ্গ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে যোগদান করত। যাই হোক, সুহরাওয়ার্দির পাতা ফাঁদে পা দিলেন কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়। এঁদের দু'জনের হাত থেকে বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব তখন চলে গেছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের হাতে। সম্ভবত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব সমর্থন করে শরৎবাবু ও কিরণবাবু হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিরণশঙ্কর রায় আবার ছিলেন ঢাকা জেলার মস্ত বড় জমিদার। তাই তাঁর আশঙ্কা ছিল যে বাংলা ভাগ হলে তাঁর জমিদারি বেহাত হয়ে যাবে। কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালি গণহত্যায় সুহরাওয়ার্দির ভূমিকার কথা তাঁরা ভুলে গেলেন।

শরৎ বসু ও আবুল হাশিম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার একটি খসড়া সংবিধানও তৈরি করেন। বর্ধমানের মানুষ এই আবুল হাশিম ছিলেন বাংলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি- যিনি কলকাতা দাঙ্গার আগে খুব স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু খুন করতে উস্কানি দিয়েছিলেন। এই খসড়া সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সবসময়েই হবেন একজন মুসলিম এবং সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সমিতি থাকবে তাতে ৩০ জনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (১৬ জন) হবেন মুসলমান। অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখার একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে রাখা হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে ভাগ করা, সেই সময় থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন বাঙ্গালী হিন্দুদের বিষয়টি বুঝিয়ে জনমত তৈরি করার জন্য। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তিনি প্রচণ্ড বেগে সারা বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন এবং বড় বড় জনসভায় ভাষণ দিয়ে মানুষকে বাংলা

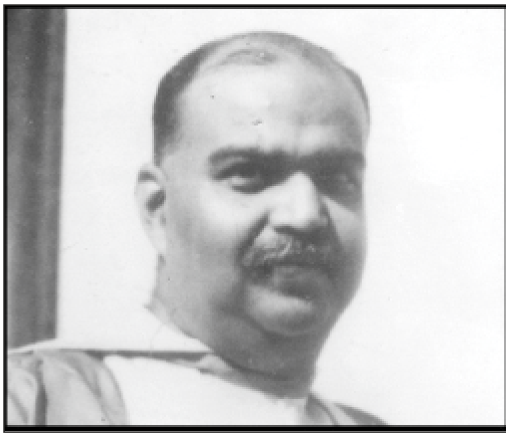

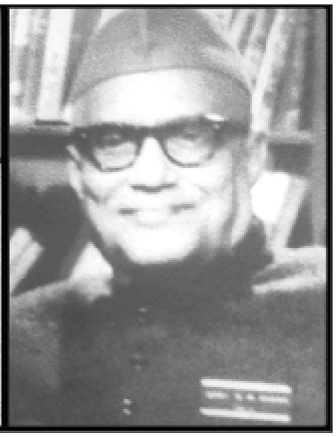

ভাগের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে লাগলেন। তিনি কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখলেন যে, তারাও যেন এই দাবীকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭-এর ১৫ই মার্চ কলকাতায় হিন্দু মহাসভা একটি দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে লর্ড সিনহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান, হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু মানুষও উপস্থিত হন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে বাংলা প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হবে। এই সভায় একটি কমিটিও গঠিত হল যাদের কাজ হবে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা যা সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-র ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লেখা হয় - "সম্প্রতি বাংলার কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী- কারণ বাংলার লীগ শাসনাধীনে, বাঙ্গালী হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি, ডঃ প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।"

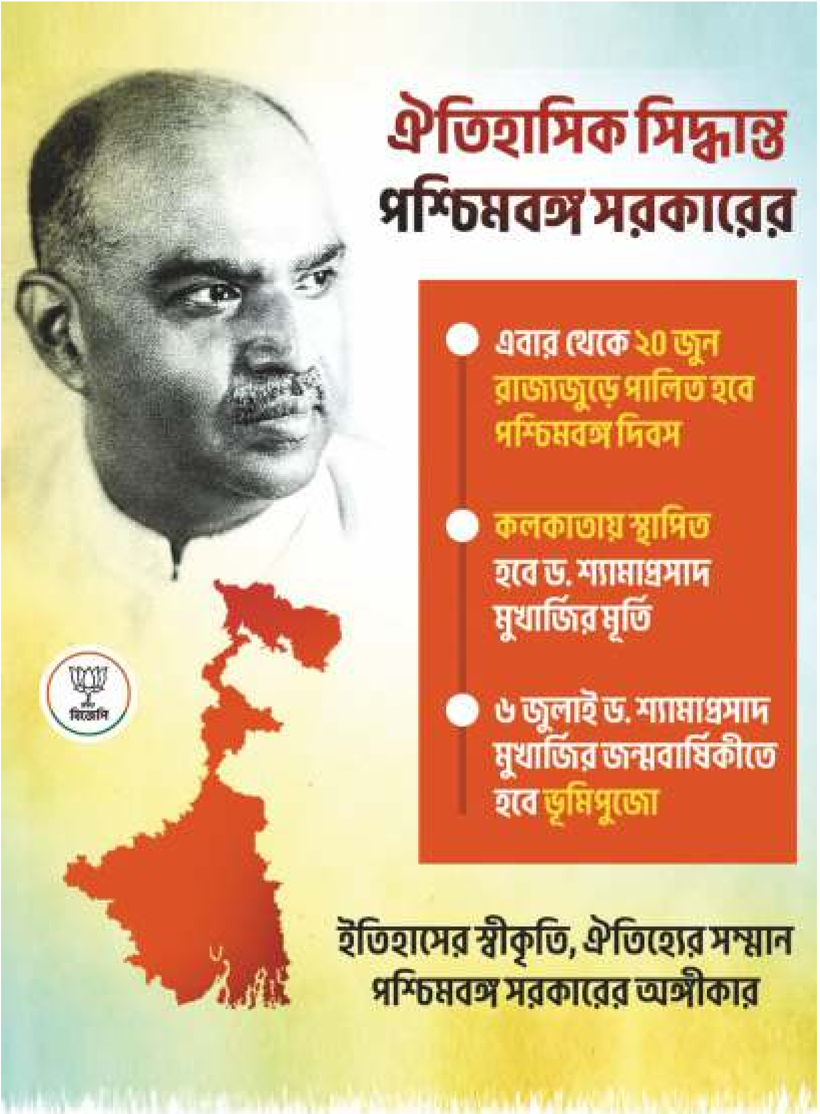

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি'-তে লিখেছেন- ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার থেকে তিন দিন ধরে (৪-৬ এপ্রিল) বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার কনফারেন্স তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা এপ্রিল নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, যেহেতু মুসলিম লীগ বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, সেজন্য হিন্দুরাও বাংলায় একটি শক্তিশালী সরকারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করবে। বাঙ্গালী হিন্দুদের নিকট এটি একটি জীবন-মরণের প্রশ্ন। যদি হিন্দুদের পছন্দমত কোন শাসনতন্ত্র না হয়, তাহলে তাঁদের হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শাসনের অধীনে দাসত্বের জীবন যাপন করতে হবে। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে খুবই সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমরা বঙ্গভঙ্গের মারফত হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক মাতৃভূমি চাই। তিনি বলেন- "Let us declare today that as the Muslim League persists in its fantastic idea of establishing Pakistan in Bengal, the Hindus of Bengal must constitute a separate Province under a strong National Government. This is not a question of partition. It is a question of life and death for us, the Bengalee Hindus. Unless you can have an administration of your own choice, you shall be serfs under an anti-Hindu communal regime and you can never protect your oppressed brother and sister."

৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "I can conceive of no other

শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজ়লুল হক ও সরোজিনী নাইডু, ১৯৪১, কলকাতা।

solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let to major communities residing herein live in peace and freedom." ("বাংলা ভাগ ছাড়া বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার অন্য কোন সমাধানের কথা আমি ভাবতে পারছি না- এটি হলেই দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই স্বাধীনতা ও শান্তি নিয়ে বসবাস করতে পারবে")। ৪ ঠা এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা বিভাগের পক্ষে যে সিদ্ধান্ত নেয় তাকেও স্বাগত জানান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং অনুষ্ঠানের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত শুনতে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ সমবেত হন শেষ দিন ৬ই এপ্রিল। তারকেশ্বরে এই সম্মেলন উপলক্ষে ৬ই এপ্রিল যে মহতী জনসভাটি হয় তাতেই সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সনৎ কুমার রায়চৌধুরী এবং সমর্থন করেন ঢাকার সূর্যকুমার বসু। এই প্রস্তাব অনুযায়ী – সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানে যাবে না, পশ্চিম অংশ বাঙ্গালী হিন্দুর নিজভুমি হিসাবে স্বতন্ত্র রাজ্য হয়ে ভারতে থাকবে। এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে কর্মসূচি স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। ঠিক করা হয় যে, জুন মাসের মধ্যে ১ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক মাঠে নামবে।

বাংলার ছোটলাট বারোজ ভেবেছিলেন ঢাকায় কিরণশঙ্কর রায়ের জমিদারি স্বার্থের দুর্বলতা এবং শরৎ বসুর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা সৃষ্টি করে ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করবেন। কিন্তু তাঁর এই সাধের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করতে শ্যামাপ্রসাদ উঠে পড়ে লাগলে ১৯৪৭-এর ১২ই এপ্রিল বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে একটি গোপন পত্রে বাংলা ভাগ নিয়ে হিন্দু মহাসভার প্রবল আন্দোলন এবং তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বিশাল হিন্দু কনফারেন্স ও সেখানে আন্দোলনের নেতৃত্বভার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ প্রসঙ্গে লেখেন- "The movement for partitioning Bengal…. Continues to gather strength. A conference convened at Tarakeswar (Hooghly District) during the Easter holidays was attended by a very large and enthusiastic audience. A resolution was passed authorizing Dr. Syamaprasad Mookerjee to constitute a council of action to establish a separate homeland for the Hindus of Bengal; 1,00,000 volunteers are to be enrolled by the end of June, the Constituent Assembly are to be asked to appoint a Boundary Commission; and as soon as the area of the new Provinces has been settled, the Hindu members of the Legistative Assembly in this area are to demand that it should be constituted into a province; if necessary leaving the Bengal Assembly and forming themselves into a separate legislative body. It was emphasized that the new province should be constituted before the

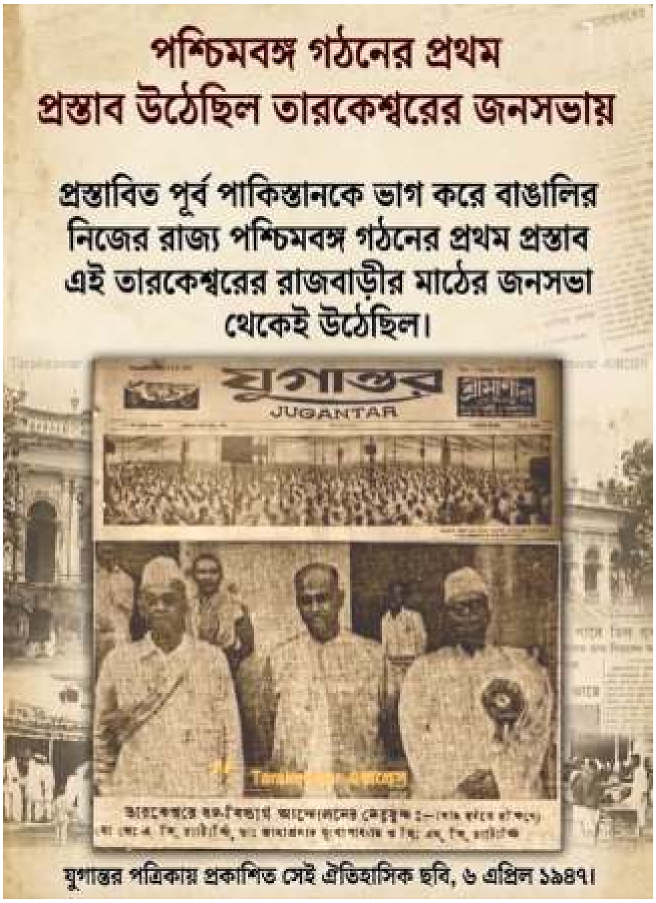

যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সেই ঐতিহাসিক ছবি, ৬ এপ্রিল ১৯৪৭।

British Govt. transferred power. Another resolution demanded the formation of two regional ministries as an immediate step to restore peace and order in the province." মাউন্টব্যাটেনকে লেখা বারোজের চিঠি থেকে আরও জানা যায়ঃ "On the same day as the Tarakeswar Committee, the Executive Committee of the Bengal Provincial Congress Committee also urged the immediate setting up of two regional Ministries and resolved that if His Majesty's Government contemplated handing over its power to the existing Government of Bengal, such portion of Bengal as wished to remain in India should be formed into a separate province."

বাংলা ভাগ করা উচিত কিনা এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৪৭-এর ২৩-এ মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত একটি জনমত সমীক্ষা করে। ফলাফল ঘোষিত হয় ২৩-এ এপ্রিল। এতে মোট ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৯ টি উত্তর আসে। এর মধ্যে ১.১% উত্তর বাতিল হয়। বাকি উত্তরের মধ্যে ৯৮.৩% বাংলা ভাগের পক্ষে ও ০.৬% বিপক্ষে মত দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০.৪% ছিল মুসলমান। অর্থাৎ, এ সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন তা বোঝা যায়।

১৯৪৭-এর ২৩-এ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কেন বাংলা ভাগ করা দরকার। এই পরিকল্পনা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ এবং মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলি বড়লাটের আপ্তসহায়ক লর্ড ইসমে-র কাছে দিয়ে আসেন। ১৯৪৭-এর মে মাসে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস একত্রে জনসভা ডাকে যার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার। ১৯৪৭-এর ২ রা মে শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই তথ্যনির্ভর পত্রে তিনি বাংলাভাগের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। এই চিঠিতে বাংলা ভাগের দাবী করে শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে, "Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan."

কলকাতার ব্রিটিশ মালিকানাধীন দৈনিক

শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে বহু বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ সমর্থন করেছিলেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের।

'The Statesman' ১৯৪৭-এর ২৪-এ এপ্রিল "Twilight of Bengal" শিরোনামে একটি সংবাদে লেখে, গত ১০ সপ্তাহের মধ্যে বাংলা ভাগ করার আন্দোলন একটি ছোট মেঘপুঞ্জের আকার থেকে একটি বিশাল ঝড়ের আকার নিয়েছে এবং এই ঝড় পুরো প্রদেশ জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যদিও এর কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কলকাতা। এই ঝড় আরম্ভ করেছিল হিন্দু মহাসভা।

১৯৪৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে গান্ধী ও নেহরু-কে তিনি বাংলা ভাগের পক্ষে বললে তাঁরা খুব একটা নির্দিষ্ট করে কিছু জানান নি। ১৯৪৭-এর ১৩ই মে শ্যামাপ্রসাদ সোদপুরে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সুহরাওয়ার্দির যুক্তবঙ্গের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। গান্ধী বলেন, তিনি এখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি। শ্যামাপ্রসাদ যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে পারেন কি না? স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গান্ধী এর কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল খুব দৃঢ়ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠিতে জানান জানান যে, শ্যামাপ্রসাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। বাংলার হিন্দুরা যতদিন নিজেদের স্বার্থ বুঝছে এবং সেই অবস্থান থেকে না সরছে ততদিন ভয়ের কোন কারণ নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার ডাক মুসলিম লীগের পাতা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বাংলাকে কখনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবী নিয়ে সোচ্চার হতেই কংগ্রেসিরা দেখল তাদের ভোটার যারা- সেই হিন্দুরা (বাংলার মুসলিমরা প্রায় সকলেই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল) তাদের নপুংসকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। তখনই বাংলার কংগ্রেস দল নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবী তোলে ১৯৪৭-এর ৪ঠা এপ্রিল। বাংলার আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য পূরণের জন্য ৭৬ টি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৫৯ টির আয়োজন করে বাংলার কংগ্রেস কমিটি, ১২ টির আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং পাঁচটি যৌথভাবে আয়োজিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দ বাংলাকে ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের পক্ষে আনা হবে, নাকি পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হবে তা স্থির করতে পারছিলেন না। এইসময় বাংলার কংগ্রেস কমিটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করেই, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭ এর ২০-এ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের পশ্চিম অংশের সদস্যরা বাঙ্গালী হিন্দুর হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করান। ফলে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয় এবং বাঙ্গালী হিন্দু তার মাথা গোঁজার একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পায়। এবং পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে ধর্মীয়ভাবে অত্যাচারিত হয়ে যে উদ্বাস্তুর স্রোত আসা শুরু হয় (যা এখনও চলছে) তাদের ও তাদের বংশধরদের আশ্রয়স্থলও হয়ে দাঁড়ায় এই পশ্চিমবঙ্গ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই কীর্তি (পশ্চিমবঙ্গ গঠনে) তাঁর জীবনীকার তথাগত রায়ের মতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। নেহরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, "আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।" উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।"

পাকিস্তান থেকে হিন্দুপ্রধান এলাকাকে আলাদা করার দাবীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। সঙ্গে ডঃ মেঘনাদ সাহা, শ্রীমতী আভা মাইতি, রামানন্দ চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

স্বপ্নের মন্ত্রিসভা, সর্বসাধারণের মন্ত্রিসভা

অভিরূপ ঘোষ

বিজেপির এই প্রথম মন্ত্রিসভা সমস্ত আঙ্গিকেই এক উজ্জ্বলতম সকালের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিনিধিত্ব, যোগ্যতা, নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক ভারসাম্য এবং আঞ্চলিক সমতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা এই মন্ত্রিসভায় দেখা যাচ্ছে, তা অভূতপূর্ব এবং নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গকে তার হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ।

'A party with a difference'। ঠিক এভাবেই বিজেপিকে বারবার সংজ্ঞায়িত করেছেন লালকৃষ্ণ আদবানি, অটলবিহারী বাজপেয়ী, নরেন্দ্র মোদী থেকে আরম্ভ করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পর্যন্ত সকলেই। অন্যান্য political দলের মতো শুধু মুখে বলে ক্ষান্ত হননি তাঁরা, কাজেও করে দেখিয়েছেন এবং দেখাচ্ছেন। বিজেপির প্রথম মন্ত্রিসভা এই সংজ্ঞারই এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে ডানা মেলল পশ্চিমবঙ্গের বুকে। সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এবারে এমন এক মন্ত্রিসভা গঠন করা হল, যাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গবেষক ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত যেমন আছেন, তেমনি আউসগ্রামে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করা কলিতা মাঝিও আছেন। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর নীতিতে চলা বিজেপি যে গোটা রাজ্যের প্রতিটি অংশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য কাজ করতে চলেছে, তা এই মন্ত্রিসভার গঠন থেকেই পরিষ্কার। এই প্রবন্ধে কয়েকটি প্রেক্ষিতে আমরা দেখব, কীভাবে বাম ও তৃণমূল আমলের মন্ত্রিসভা থেকে বিজেপির সরকার কয়েক যোজন এগিয়ে।

যোগ্যতার মর্যাদা:-

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার এক শিক্ষক হলেন শিক্ষামন্ত্রী, ডাক্তারবাবু হলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আইনজীবী পেলেন আইনের দায়িত্ব, যুব সভাপতি হলেন ক্রীড়ামন্ত্রী, কৃষক হলেন কৃষিমন্ত্রী আর সর্বোপরি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার নিরিখে সব থেকে এগিয়ে থাকা বিধায়ক হলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার একই সঙ্গে তিনজন ডাক্তার, তিনজন ডক্টরেট, অন্তত চারজন প্রথিতযশা শিক্ষক এবং একাধিক উকিল ও প্রযুক্তিবিদ স্থান পেলেন মন্ত্রিসভায়। তুলনায় নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করা বামেদের এবং নিজেকে বহুভাষাবিদ ও অতিশিক্ষিত হিসেবে প্রতিপন্ন করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন তৃণমূলের প্রথম মন্ত্রিসভায় (১৯৭৭ এবং ২০১১) ডাক্তার ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী ছিলেন মাত্র একজন করে।

প্রথম ক্যাবিনেটেই বার্তা:-

মে মাসের ৯ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আরও পাঁচজন পূর্ণমন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা,

দুজন তফশিলি জাতির (মতুয়া ও রাজবংশী), একজন তফশিলি উপজাতির এবং একজন অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। স্থানগত বিশ্লেষণে একজন উত্তরবঙ্গের, একজন শিল্পাঞ্চলের, দুজন জঙ্গলমহলের এবং একজন সীমান্তবর্তী জেলার। অর্থাৎ, শুরুতেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় ভাবনাকে পাথেয় করে তথাকথিত শহুরে এলিট কালচারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বিজেপি।

জেলার প্রতিনিধিত্ব:

মুখে শ্রেণিসংগ্রামের কথা বললেও ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট মূলত কলকাতাকেন্দ্রিকতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘ ৩৪ বছরে তাঁদের দুই মুখ্যমন্ত্রীকে শহরের বাইরে খুব একটা বেরোতে দেখা যায়নি। এরপর ২০১১ সালে ক্ষমতায় এল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনীতিতে ন্যূনতম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিও জানেন, পুরো মন্ত্রিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কারও কোনও গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু তবু, খাতায়-কলমে একটা মন্ত্রিসভা তো দরকার! সেটা হল এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, অমিত মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও জাভেদ খানের মতো নেতারা। ঘটনাচক্রে, এঁরা প্রত্যেকেই শহর কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা ও বিধায়ক ছিলেন। জেলার প্রতিনিধিত্ব ছিল গুরুত্বহীন এবং ন্যূনতম। অন্যদিকে বিজেপির মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ অব্দি প্রতিটি জেলার যথাযথ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে মোট ৪১ জন মন্ত্রীর ৩৭ জনই এবারে জেলা থেকে। উল্লেখ্য বহু দশক পর এবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন জেলা থেকে।

নারী ক্ষমতায়ন:-

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসে বামফ্রন্ট সরকার। অবাক করা বিষয় হল, মুখে মহিলা ক্ষমতায়নের কথা বলা সেই সরকারে ২৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে একজনও মহিলা ছিলেন না। এরপর উন্নততর বাম অর্থাৎ তৃণমূল ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর সেই সংখ্যা হয় তিন। আর ২০২৬ সালে বিজেপি শপথ গ্রহণ করার পর এখনই সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত। অর্থাৎ, বাম ও তৃণমূলের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক মহিলাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছে বিজেপি।

তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর এগিয়ে আসা:-

১৯৭৭ সালের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে যেমন একজনও মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না, তেমনই একজনও আদিবাসী প্রতিনিধি ছিলেন না। একইভাবে কুড়মি, রাজবংশী, মতুয়া—কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিই ছিল না ওই মন্ত্রিসভায়। পরবর্তী ছয়টি মন্ত্রিসভাতেও এই সম্প্রদায়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। এই ঘটনা প্রমাণ করে, মুখে যাই বলুক না কেন, বামফ্রন্ট আদতে ছিল তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীবিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমষ্টি। তৃণমূলের আমলেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। অন্যদিকে বিজেপি ব্যাপক সংখ্যায় পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভায়। তৃণমূল মন্ত্রিসভায় যেখানে একজন মাত্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মন্ত্রী ছিলেন, সেখানে বিজেপি মন্ত্রিসভায় সংখ্যাটা চার। প্রথম তৃণমূল মন্ত্রিসভায় যেখানে চারজন তপশিলি জাতির প্রতিনিধি ছিলেন, সেখানে প্রথম বিজেপি মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন ন'জন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রেও তথ্য বিজেপির পক্ষে। মুসলিমদের অন্যায়ভাবে পাইয়ে দেওয়া ওবিসি বাদ দিলে, তৃণমূল মন্ত্রিসভার তুলনায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিও বিজেপিতে অনেক বেশি।

উত্তরবঙ্গের উত্থান:-

স্বাধীনতার পর থেকে তৃতীয় তৃণমূল সরকার পর্যন্ত সবসময়ই ব্রাত্য থেকে গেছে উত্তরবঙ্গ—নানা ভাবে, নানা দিক থেকে, নানা অজুহাতে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মাত্র দুজন মন্ত্রী ছিলেন উত্তরবঙ্গ থেকে; একজন সমবায়মন্ত্রী, অন্যজন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী। প্রথম তৃণমূল সরকারে দুজন পূর্ণমন্ত্রী এবং তিনজন প্রতিমন্ত্রী স্থান পেলেন উত্তরবঙ্গ থেকে। দুজন পূর্ণমন্ত্রী পেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও বনদপ্তর। আর প্রথম বিজেপি সরকারে পাঁচজন পূর্ণমন্ত্রী-সহ মোট দশজন মন্ত্রী শপথ নিলেন উত্তরবঙ্গ থেকে। মহাগুরুত্বপূর্ণ স্কুলশিক্ষা মন্ত্রক, পরিষদীয় মন্ত্রক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে শুরু করে পর্যটন, বন, পরিবেশ, আবাসন, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, জলসম্পদ এবং নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব গিয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিধায়কদের কাছে।

এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার, স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার স্পিকার করা হল উত্তরবঙ্গ থেকে। কোচবিহারের রথীন্দ্র বসুর আগে আরও দশজন স্পিকার হয়েছিলেন এই রাজ্যে। ঘটনাচক্রে, তাঁদের মধ্যে কেউই উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ছিলেন না।

কথায় বলে, 'Morning shows the day'। বাম ও তৃণমূলের গহন কালো রাত্রির শেষে বিজেপির এই প্রথম মন্ত্রিসভা সমস্ত আঙ্গিকেই এক উজ্জ্বলতম সকালের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিনিধিত্ব, যোগ্যতা, নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক ভারসাম্য এবং আঞ্চলিক সমতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা এই মন্ত্রিসভায় দেখা যাচ্ছে, তা অভূতপূর্ব এবং নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গকে তার হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ।

ডাবল ইঞ্জিনের ধাক্কায় এক মাসেই রাজ্যে বসন্ত বাতাস

মাত্র ৩০ দিনে ভেঙ্গে খানখান তৃণমূল, একঘরে মমতা-অভিষেক

জয়ন্ত গুহ

মাত্র একমাসে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার বাংলায় যে অকাল বসন্ত এনে দিয়েছে তা কি বামেদের ৩৪ বছর এবং মমতা সরকারের ১৫ বছরে এনে দেওয়া যেতোনা? যেত, অবশ্যই যেত। আসলে ছিল সদিচ্ছার অভাব এবং রাজ্যকে গোল্লায় পাঠিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধীতা ও বঞ্চনার রাজনীতিতে বছরের পর বছর এরাজ্যে গদি টিকিয়ে রাখা। এই ভাবনার জন্যেই বাংলায় আজ তাঁরা অপ্রয়োজনীয় বোঝা।

নির্বাচনের আগে যেমনটা ঠিক বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ-নীতিন নবীন। যেমনটা ঠিক বলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী-শমীক ভট্টাচার্য। যেমনটা ঠিক বলেছিল বিজেপি তার সঙ্কল্পপত্রে। ঠিক তেমনটাই হল। মাত্র এক মাসেই রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের ডাবল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মানুষের মনে নতুন আশা। মুখে হাসি। ভয়-নিরাশা-তোলাবাজি-গুন্ডামির পরিবেশ এখন অতীত। মানুষের মনে ফিরছে স্বস্তি। ১৫ বছর বাদে অবশেষে মানুষের ওপর সরকারের হুমকি-জুলুমবাজি-রক্তচক্ষু সরে গেছে। সরকার এখন মানুষের কথা শুনছে। সেবাধর্ম নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে মানুষের। এতদিন বাংলার মানুষ শুনেছে, এখন বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখছে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ধামাকা। আসলে সদিচ্ছা থাকলে সব হয়। সব সম্ভব যখন সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকারের নীতিতে চলে। সরকার যখন 'আমি' নয়, 'আমরা'-র নীতিতে চলে তখন পশ্চিমবঙ্গের মত 'না-পাওয়ার দেশে'-ও বসন্তবাতাস বইতে পারে। মাত্র এক মাসেই।

অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া নজর

যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা দিনের পর দিন এরাজ্যে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সমস্ত কল্যাণময় যোজনার সুবিধা নিয়েছে, এরাজ্যের অর্থনীতিতে ভাগ বসাচ্ছিল, তৃণমূলের আশ্রয়ে চুপচাপ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল এরাজ্যের ভবিষ্যৎ তাদেরকে তাড়ানো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে তাড়ানো হবে, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। ৪ মে-র পর থেকেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ঢল নেমেছে সীমান্তে। তৈরি হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার। মুখ্যমন্ত্রীর

দেওয়া হিসেবমতো এক মাসে ফিরে গিয়েছেন প্রায় পাঁচ হাজার অনুপ্রবেশকারী, আটক শিবিরে অপেক্ষায় আরও হাজারখানেক।

কিন্তু সীমান্তে বেড়া না দিলে তো অনুপ্রবেশ চলতেই থাকবে। মমতা সরকারের আমলে করা যায়নি একাজ। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে তৃণমূল অনুপ্রবেশকে মদত দিচ্ছে, বারবার অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার নির্দেশ পাঠালেও মমতার সরকার জমি না-দেওয়ায় দীর্ঘদিন আটকে ছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ। রাজ্যে বিজেপি মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মে মাসেই হস্তান্তর হয়ে যায় মোট ১৪২.৭৯ একর জমি। অনুপ্রবেশের অভিশাপ মুক্ত হওয়ার আশায় বাংলা। এরাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে সরকারি টাকায় এতদিন অনুপ্রবেশকারীরা তৃণমূলের হাত ধরে ভাগ বসাতো এবার সে টাকা গোটাটাই খরচ হবে শুধুমাত্র এরাজ্যের ভারতীয় নাগরিকদের জন্য।

অন্নপূর্ণা-বার্ধক্য ভাতা-মা ক্যান্টিন সামাজিক প্রকল্পে খুশীর হাওয়া

যেমন কথা তেমন কাজ। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর নাম পাল্টে হয়েছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। মাস গেলে প্রাপ্তির পরিমাণও বেড়েছে। 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় পাওয়া যাচ্ছে ৩ হাজার টাকা। কিন্তু ১৩ পাতার ফর্ম ফিলাপ নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছে বাম-ফুল। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় সাধারণ মানুষ। প্রচার করা হচ্ছে ফর্ম ফিলাপ করলে অনেকেই টাকা পাবেনা বা লক্ষ্মীর ভান্ডার যারা পেতো তারা আর পাবেনা বা সরকার আসলে এনআরসি-র পথে এগোচ্ছে বা সরকার সবার হাঁড়ির খবর জেনে নিচ্ছে। বাস্তব কিন্তু আসলে তা নয়। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বৈধ ভাবে যাঁদের ভাতা প্রাপ্য, তাঁদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।

ভয় তাহলে পাওয়ার কথা যারা বৈধ নয়। বৈধ নাগরিক নয়। যারা নাম-বয়স নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছে তাঁদের ভয় পাওয়ার কথা। এবং এনিয়ে ভয় থাকা উচিৎ। খুব দরকার। অবৈধভাবে বা ঘুরপথে একজনেরও 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র টাকা পাওয়া উচিৎ নয়।

বার্ধক্য ভাতা এক হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে দু'হাজার টাকা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে দেওয়া যাবতীয় ভাতা—যেমন মোয়াজ্জিম বা পুরোহিত ভাতা।

'মা ক্যান্টিন'-এর নাম বদলে হয়েছে 'মা আহার' । পাঁচ টাকায় দেওয়া হবে দুপুরের খাবার। বদল হয়েছে মেনুতেও। বাংলা ও বাঙালি বিরোধী মমতা সরকারের নিয়ম বদলে সপ্তাহে এখন দু'দিন মাছ-ভাত খাওয়ানো হবে 'মা আহার'-এ। অনেক আগেই হতে পারতো এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সামান্য মাছ-ভাতের অধিকারও বাঙালীর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল সরকারের আড়ালে ব্যানার্জি পরিবার।

দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানে দফারফা তৃণমূল

বিজেপি সরকারের প্রথম সাত দিনেই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতার সংখ্যা ৭০। এক মাসে যা ৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। গ্রেফতারের তালিকায় সুজিত বসু, স্বরূপ বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডল, জাহাঙ্গির খান, অসিত মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বড় নাম। ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি এবং তৃণমূল বিধায়কদের সই-কাণ্ডে সিআইডি-র মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসি-কাণ্ডে রীতিমত বিপাকে অরূপ বিশ্বাস।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে তদন্ত কমিটি। জিটিএ-তে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তভার সিবিআই-কে দেওয়া হয়েছে। এত দিন লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন যে সব পুরুষ, তাঁদের খোঁজে গড়া হয়েছে সিট।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, "যেখানেই হাত দিচ্ছি, পচা দুর্গন্ধ। এ বার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জেল বানাতে হবে।"

সামাজিক প্রকল্পে 'ডবল ইঞ্জিনে'-র ম্যাজিক

পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল আয়ুষ্মান ভারত। সাধারণ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষরাই এই সুবিধা পাবেন। মমতা ব্যানার্জি চালু হতে দেয়নি। আটকে রেখেছিল কেন্দ্রের সুবিধা। **সরকারের মাসপূর্তির দিনেই দিল্লিতে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে শামিল হতে চেয়ে মউ স্বাক্ষর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।** তৃণমূল সরকারের আমলে যে ফাইল বঙ্গোপসাগরে চাপা পড়ে ছিল, আজ তা আমজনতার জন্য বাস্তবায়িত হয়ে গেল। রাজে প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করায় খুশির হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় কোটি পরিবার সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রাথমিক খাতে ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার নির্দেশ অনুযায়ী আপনি যদি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ডিজিটাল রেশন কার্ড-এর অধীনে থেকে থাকেন, তবে আয়ুষ্মান প্রকল্প আপনার জন্য। একমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই কেন্দ্রের এই বীমার সুবিধা পাবে। এতদিন 'স্বাস্থ্য সাথী'র ব্যবস্থা শুধু রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবার 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর এই কার্ডে অ্যাপোলোর মতো হাসপাতাল থেকে টাটা

ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, দিল্লির হাসপাতাল, সিএমসি ভেলোর, চেন্নাইয়ের হাসপাতালে, হায়দরাবাদের শঙ্কর নেত্রালয় হাসপাতালে সুবিধা পাওয়া যাবে। হার্টের অপারেশন, কিডনির চিকিৎসা , ক্যানসারের চিকিৎসার পাশাপাশি নিউরোসার্জারি , মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিভিন্ন জরুরি অস্ত্রোপচার, ডায়াগনস্টিক টেস্ট ও হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত খরচ বহন করবে 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্য বীমা।

দুর্নীতি এবং হিসাব না-দেওয়ার অভিযোগে একশো দিনের দিনের কাজের প্রকল্প (মনরেগা) এবং আবাস যোজনার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এবার ১ জুলাই থেকে আবার চালু হচ্ছে মনরেগার পরিবর্তে 'ভিবি-রামজি' প্রকল্প। 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা', 'উজ্জ্বলা যোজনা', 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', 'দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা'-র মতো সামাজিক প্রকল্প।

৫০ বছর বাদে বাংলাকে বাঁচাতে শিল্প-পরিকাঠামো উন্নয়নে মরীয়া রাজ্য

গৌতম আদানির পুত্র করণ আদানি এবং 'লারসেন অ্যান্ড টুব্রো' গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এস এন সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির রাজ্য সভাপতি চাইছেন, টাটা আবার সিঙ্গুরে ফিরুক। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে রাজ্য সভাপতির সাফ কথা, বিনিয়োগ সুরক্ষিত থাকবে এবং জমি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না।

টাটাদের বাংলায় ফিরিয়ে আনা এবং লগ্নিকারীদের জন্য স্বচ্ছ পরিকাঠামো গড়তে জোরালো বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর স্বচ্ছ অবস্থান এবং কর্মসংস্থানমুখী ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের দুই প্রথম সারির বণিকসভা— 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' এবং 'মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' (MCCI) বিবৃতি জারি করেছে।

তাজপুরের পরিবর্তে দাদনপাত্রবাড়ে সমুদ্রবন্দর গড়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

আসছে আমূল। রাজ্যে প্রায় ৬৫০-৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে 'আমূল' তাদের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ মালিকানাধীন দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করতে চলেছে। এখানে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী জয়েন মেহতা এবং কায়রা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন তথা আমূল ডেয়ারির কর্ণধার শ্রী অমিত ব্যাস-এর সঙ্গে বৈঠক হয়ে গেছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর।

স্বাস্থ্যে হাল ফেরানোর উদ্যোগ

মমতা সরকারের বুলি সর্বস্ব নীতি নয়, স্বাস্থ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা নজরদারি চালানোর কথা ঘোষণা করেছে সরকার। দালালচক্র রুখতে পেশাদারদের নিয়োগ করার ভাবনাও রয়েছে। আমজনতাকে সস্তায় ওষুধ দিতে রাজ্যে চালু হবে ৪০০টিরও বেশি 'প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র'। শুরু হয়েছে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধের টিকাকরণ কর্মসূচি।

রেলে লগ্নির জোয়ার

রাজ্যে রেল প্রকল্পে ১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বৈঠকে। বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করে মমতা সরকার আটকে রেখেছিল যে মেট্রো রেলের কাজ সেই চিংড়িঘাটায় মেট্রো রেলের বহুপ্রতীক্ষিত গার্ডার বসে গিয়েছে রেকর্ড সময়ে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলাকে রেল মানচিত্রে যুক্ত করা, নতুন স্টেশন তৈরি এবং উন্নত ট্রেন পরিষেবা চালু করার মাধ্যমে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সরকারি চাকরিতেও আশার আলো

নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার কথা ঘোষণা করেছে শুভেন্দুর সরকার। আবেদনের বয়ঃসীমা ৫ বছর বাড়ানো হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল সরকারি চাকরিতে নিয়োগও।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারে এসে বিজেপি ডিএ-র বকেয়া কিস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেছে। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা রাজ্য সরকারি কর্মীদের অনেক দিনের দাবি, যা আটকাতে তৃণমূল সরকার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল। ঘোষণা হয়েছে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের কথাও।

মাত্র একমাসে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার বাংলায় যে অকাল বসন্ত এনে দিয়েছে তা কি বামেদের ৩৪ বছর এবং মমতা সরকারের ১৫ বছরে এনে দেওয়া যেতোনা? অনুপ্রবেশকারীদের কি আটকানো যেতনা? রাজ্যের কৃষি এবং অর্থনীতিতে জোয়ার আনা যেতনা? যেত, অবশ্যই যেত। আসলে ছিল সদিচ্ছার অভাব এবং রাজ্যকে গোল্লায় পাঠিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধীতা ও বঞ্চনার রাজনীতিতে বছরের পর বছর এরাজ্যে গদি টিকিয়ে রাখা। এই ভাবনার জন্যেই বাংলায় আজ তাঁরা অপ্রয়োজনীয় বোঝা।

পশ্চিমবঙ্গে রেলের অগ্রগতি

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কার্যকারিতার এক চাক্ষুষ প্রমাণ

সৌভিক দত্ত

পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুয়োরানী হয়ে থাকার দিন শেষ। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে বাঙালিও এবার বাকি ভারতের উন্নয়নের স্বাদ পাবে, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানতালে এগোতে পারবে। সরকার বদলের মাত্র এক মাসের মধ্যে রেল ব্যবস্থার এই উল্কাগতি সেই অনাগত সোনার বাংলার আগমন ধ্বনি শোনাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিধানচন্দ্র রায়ের কিছুটা সময় বাদ দিলে বাকি সময়টা পশ্চিমবঙ্গ ছিল প্রায় উপেক্ষিত একটি রাজ্য। এবং তাতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দুই এরই সমান অবদান ছিল। একদিকে যেমন বাঙালির মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ ও নেতাজির ভূত দেখা কংগ্রেস কখনই চায়নি বাঙালির অগ্রগতি বজায় থাকুক অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্ট সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতাকেই নিজেদের আইডেন্টিটি বানিয়ে ফেলেছিল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকেই পশ্চিমবঙ্গে জায়গা দেওয়া হতো না, কারণ সেটা হলেই আর কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ধুয়ো তুলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ গোছানো যাবে না।

সবথেকে সহজ উদাহরণ বোধয় চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্প। দিনের পর দিন এই প্রকল্পের অনুমোদন আটকে রেখেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জির সরকার অগ্রাহ্য করে। প্রায় দুই বছর ধরে এই প্রকল্পের কাজ আটকে রেখেছিল তৃণমূল সরকার। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মাত্র ১২০ ঘন্টা বা পাঁচ দিনেই সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এর থেকে বুঝতে পারা যায় নিজেদের স্বার্থের জন্য এতদিন ধরে বাঙালিকে কোন অন্ধকারে ডুবে রেখেছিল তৃণমূল কিংবা তার আগের সরকারগুলো।

আর এই ডুবে থাকা সরকারি প্রকল্পগুলোরই অন্যতম হলো রেল। যদিও রেল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু নির্বিঘ্নে জমি পাওয়ার জন্য বা কাজ চালানোর জন্য তাকে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করতেই হয়। এই অবৈধ দখলদারদের থেকে প্ল্যাটফর্ম খালি করার বিষয়টাই যেমন। যাত্রী স্বাচ্ছন্দের সর্বনাশ করে দেওয়া এই অবৈধ দোকানগুলোকে রেল এতদিন তুলতে পারেনি কারণ রাজ্যে যে সরকার ছিল তারা অবৈধ কাজকর্ম কেই প্রশ্রয় দিত। কিন্তু সরকার বদল হওয়া মাত্রই সব প্লাটফর্ম খালি করে রেলের জমি রেল কে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দের কোনো অভাব না ঘটে।

একইভাবে রেলের জন্য আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে বিজেপি সরকার।

এই ৪ঠা মে ক্ষমতায় আসার পরে মাত্র এক মাসের মধ্যে বিজেপি সরকার রেল ও মেট্রো সংক্রান্ত বিষয়ে এই রাজ্যে যা যা করে দেখিয়েছে সেটা আক্ষরিক অর্থেই যাদু কিংবা ঐশ্বরিক আশীর্বাদের কথা মনে করিয়ে দেয় আমাদের। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় রেলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু, মেট্রো সম্প্রসারণ এবং বৃহৎ বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক বরং।

রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাস্ক ফোর্সে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের পাশাপাশি পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, মেট্রো রেল এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (RVNL)-এর প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এর প্রধান লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা রেল প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলা। এছাড়াও রেল বোর্ড থেকে ৬১টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বৈঠকের পর ঘোষণা করা হয়েছে যে আগামী কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে রেলের সম্প্রসারণের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে। বিভিন্ন নতুন লাইন, ডাবলিং, স্টেশন উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এর জন্য এই অর্থ খরচ হবে। পাশাপাশি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের রেল উন্নয়নের জন্য ১৪,২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও রেল মানচিত্রে যোগ হচ্ছে নতুন রুট। করিমপুর, সাগর, লালগড় এবং সুন্দরবনে এবার পৌঁছাবে ভারতীয় রেল।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অবহেলিত জায়গা হলো উত্তরবঙ্গ। বিশেষত কলকাতা ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে উত্তরবঙ্গ ছিল অবাধ্য সৎ আমলাদের শাস্তিদানের জায়গা। কিন্তু এবার উত্তরবঙ্গ কেও বাংলার রাজনীতির মূল স্রোতে টেনে নিতে চলেছে বিজেপি সরকার। উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে শিলিগুড়ি–ঠাকুরগঞ্জ রেললাইন ডাবলিং প্রকল্পের জন্য ৯১৬.১৮

কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে নিউ জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি ও অধিকারীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির সংযোগ আরও উন্নত হবে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই চিকেনস নেকে আন্ডারগ্রাউন্ডে ৪০ কিমি স্ট্র্যাটেজিক রেল করিডর গড়ার কথা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই আন্ডার গ্রাউন্ড রেললাইন উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি দেশের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখবে। হলে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অস্থির রাখার বাংলাদেশি ও ডিপ স্টেটস এর প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। উল্লেখ্য, ৭ জুন উত্তরবঙ্গবাসীকে বুলেট ট্রেন উপহার দেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মাত্র ৬ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যাবে রাজধানী দিল্লিতে।

ভারতীয় রেলের অন্যতম গর্বের বিষয় হলো অমৃত ভারত প্রকল্প। এই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে কামাখ্যাগুড়ি, তমলুক, হলদিয়া, বারাভূম, আনারা এবং সিউড়ি ইত্যাদি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণের কথা আমরা জানি।

নতুন অপেক্ষা কক্ষ, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা, উন্নত টিকিট কাউন্টার, লিফট, র্যাম্প, ওয়াই-ফাই এবং উন্নত যাত্রীসুবিধা ইত্যাদি সহয়োগে মোট ১০২ টি স্টেশনের আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হবে এই বাংলায়। এছাড়াও ইতিমধ্যে বলেছি যে রেলের বহু প্রকল্পকে তৃণমূল সরকার আটকে রেখেছিল যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম কেউ না করতে পারে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরপরই মাত্র এক মাসে ৪০ টি প্রকল্পকে NOC ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। উল্কার গতিতে

এইসব প্রকল্পে কাজ এগোচ্ছে। জমিজট থেকে মুক্তির জন্য জেলাশাসকদের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যানজট এড়াতে মফস্বল এবং শহরতলীতে তৈরি হচ্ছে ৫৩৮ টি ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস। কাঁচরাপাড়া এবং হাওড়া রেলে জোর দেওয়া হচ্ছে আধুনিকীকরণে। এর ফলে কর্মসংস্থানও বাড়বে অনেক। উত্তরপাড়ার Titagarh Rail Systems ২০২৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে অ্যালুমিনিয়াম রেল কোচ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েছে। এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে উচ্চগতির ট্রেনের জন্য প্রয়োজনীয় রোলিং স্টক উৎপাদনে ভারতকে আরও আত্মনির্ভর করে তুলবে।

এছাড়াও মেট্রোর কথা তো শুরুতেই বললাম। মেট্রো প্রকল্প সঠিকভাবে চালু হলে যেহেতু শহরাঞ্চলে মানুষের অনেক সুবিধা হবে, মানুষের সময় নষ্ট কম হবে ফলে কাজের গতি বাড়বে এবং বাঙালির অর্থনীতি উন্নত হবে সেই কারণে বেটার বাংলাদেশ এজেন্ট সরকার এই মেট্রো প্রকল্পের রীতিমতো বিরুদ্ধচারণ করে গিয়েছিল। চিংড়িঘাটা অঞ্চলের অরেঞ্জ লাইনের কথা তো বললামই একটু আগে। দুই বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি যে কাজ ফেলে রেখেছিল সেটা বিজেপি করে দেখিয়েছে কয়েক ঘন্টায়। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড একটি একমুখী রাস্তা তৈরি করছে। প্রায় ১৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৯ মিটার চওড়া এই রাস্তা VIP রোডকে চিনার পার্কের সঙ্গে যুক্ত করবে। সম্ভবত আগামী মাসের মধ্যেই রাস্তা ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যাবে।

দীর্ঘদিন ধরে হলদিরাম উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায় অরেঞ্জ লাইনের শেষ দুটি পিলার নির্মাণে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ওই এলাকায় এলাকায় কাজের অনুমতি মেলায় অরেঞ্জ লাইনের শেষ পর্যায়ের পিলার নির্মাণের পথ পাওয়া গেছে। পার্পল লাইনের জোকা–ধর্মতলা মেট্রো প্রকল্পের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোকা আর প্রান্তিক স্টেশন থাকছে না। রুটটি ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত

সম্প্রসারণ করা হবে, যা দক্ষিণ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা নিয়ে আসবে। জোর দেওয়া হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা উন্নত করার দিকে। সরকারের টার্গেট হলো প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর একটি করে মেট্রো চালানো। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৮৯৫.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত শনিবার কলকাতায় এসে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে ৬০টি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির 'নেক্সট-জেনারেশন' ট্রেন অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আবার অন্যদিকে বারাসাত পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি মেট্রো পরিষেবা নিয়ে যাওয়া হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুয়োরানী হয়ে থাকার দিন এবার শেষ। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে বাঙালিও এবার বাকি ভারতের উন্নয়নের স্বাদ পাবে, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানতালে এগোতে পারবে। সরকার বদলের মাত্র এক মাসের মধ্যে রেল ব্যবস্থার এই উল্কাগতি সেই অনাগত সোনার বাংলার আগমন ধ্বনি শোনাচ্ছে আমাদের।

ছবিতে খবর

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিতে জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযানের প্রদেশ কর্মশালা।

শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাওয়ার পথে ধূপগুড়িতে দলের কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

শিলিগুড়ি বিজেপি জেলা কার্যালয়ে তফশিলি মোর্চার বিশেষ কার্যক্রমে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

কলকাতায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ বর্গ অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কার্যকর্তাদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী শিবপ্রকাশ।

'জনতার দরবার'-এ সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা সরাসরি শুনছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, সঙ্গে আছেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী ও লকেট চট্টোপাধ্যায়।

"করের বোঝা না বাড়িয়ে রাজস্ব আদায় মূল লক্ষ্য"-
সাফকথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী স্বপন দাশগুপ্তের।

দফতরের দায়িত্ব নিয়েই টাটাদের ফিরিয়ে আনার
বার্তা দিলেন নতুন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী তাপস রায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিতেই রাজ্যে ভোলবদলের আশ্বাস
দিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধ 'থ্রেট কালচার', আর জি কর ফাইল খোলার পরিষ্কার
বার্তা দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের
মন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

হাওড়া উলুবেড়িয়ার জোয়ারগুড়িতে কেন্দ্রীয় নারেগা প্রকল্পের
শুভারম্ভে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং
কৃষি বিপণন মন্ত্রী শ্রী দিলীপ ঘোষ।

"বৈচিত্র্যময় পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্ববাসীর কাছে আরও আকর্ষণীয় করে
তুলে ধরা, পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত
সকলের স্বার্থ রক্ষা করাই হবে আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার"-
ঘোষণা পর্যটন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী শঙ্কর ঘোষের।

ছবিতে খবর

'পড়াশোনা করে চাকরি হয়, এই বিশ্বাসই ফেরাতে হবে'-
দায়িত্ব নিয়েই জানিয়ে দিলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী শ্রী দীপক বর্মন।

মিরিকে 'অমৃত ২.০' যোজনার প্রকল্প পরিদর্শনে নগরোন্নয়ন ও পুর
বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং দার্জিলিং-এর সাংসদ শ্রী রাজু বিস্তা।

'ডায়মন্ড হারবার এফসির ম্যাচ ফিক্সিং, মেসিকাণ্ড সব দেখব'-
দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র।

"সব গ্রন্থাগার থেকে সরবে 'এপাং ওপাং ঝপাং' সহ মমতা ব্যানার্জির
একাধিক বই"- সাফ জানিয়ে দিলেন রাজ্যের জনশিক্ষা
প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ।

১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতার সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
মনসুখ মান্ডাভিয়া, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপির বিধায়কবৃন্দ এবং দলের অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব।

পার্টি কার্যালয়ে আবাসন দফতরের প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা, রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী-র।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের।

রাজ্যে বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও দুগ্ধশিল্পের উন্নয়ন নিয়ে নবান্নে আমূল ডেয়ারির কর্ণধার শ্রী অমিত ব্যাস মহাশয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের বৈঠক।

কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে বন্দর উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল এবং শ্রী শান্তনু ঠাকুর মহাশয়।

যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার বিশেষ বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপি বিধায়কগন সহ জেলা নেতৃত্ব।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে "প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযান" কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

ছবিতে খবর

নবান্নে "আপনার সরকার আপনার পাশে" কর্মসূচির শুভ সূচনা সহ অন্নপূর্ণা যোজনা এবং মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা কার্যক্রম।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, আধুনিক পরিকাঠামো ও মানুষের কাছে আরও দ্রুত উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে নবান্নে কেন্দ্র-রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ভার্চুয়াল বৈঠক।

ছবিতে খবর

মাননীয়
শ্রী দুধ কুমার মণ্ডল
দপ্তর :
কৃষি দপ্তর
আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

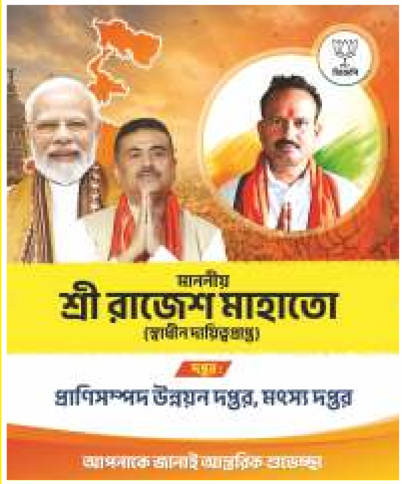
মাননীয়
শ্রী রাজেশ মাহাতো
(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
দপ্তর :
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, মৎস্য দপ্তর
আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

মাননীয়া
শ্রীমতী মালতী রাভা রায়
(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
দপ্তর :
নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, স্বনির্ভর
গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ দপ্তর
আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

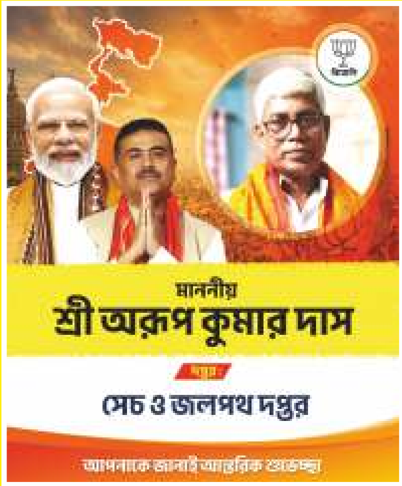
মাননীয়
শ্রী অরূপ কুমার দাস
দপ্তর :
সেচ ও জলপথ দপ্তর
আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

মাননীয়
ড. কল্যাণ চক্রবর্তী
দপ্তর :
তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর,
জৈবপ্রযুক্তি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর
আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

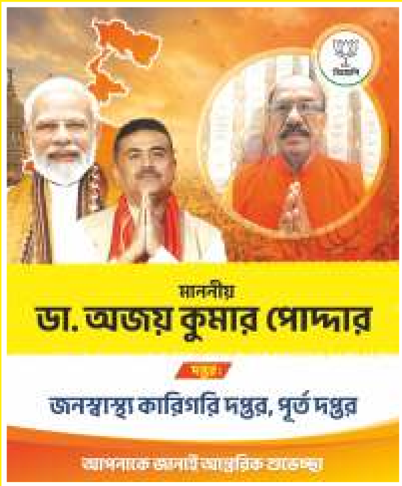
মাননীয়
ডা. অজয় কুমার পোদ্দার
দপ্তর :
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পূর্ত দপ্তর
আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

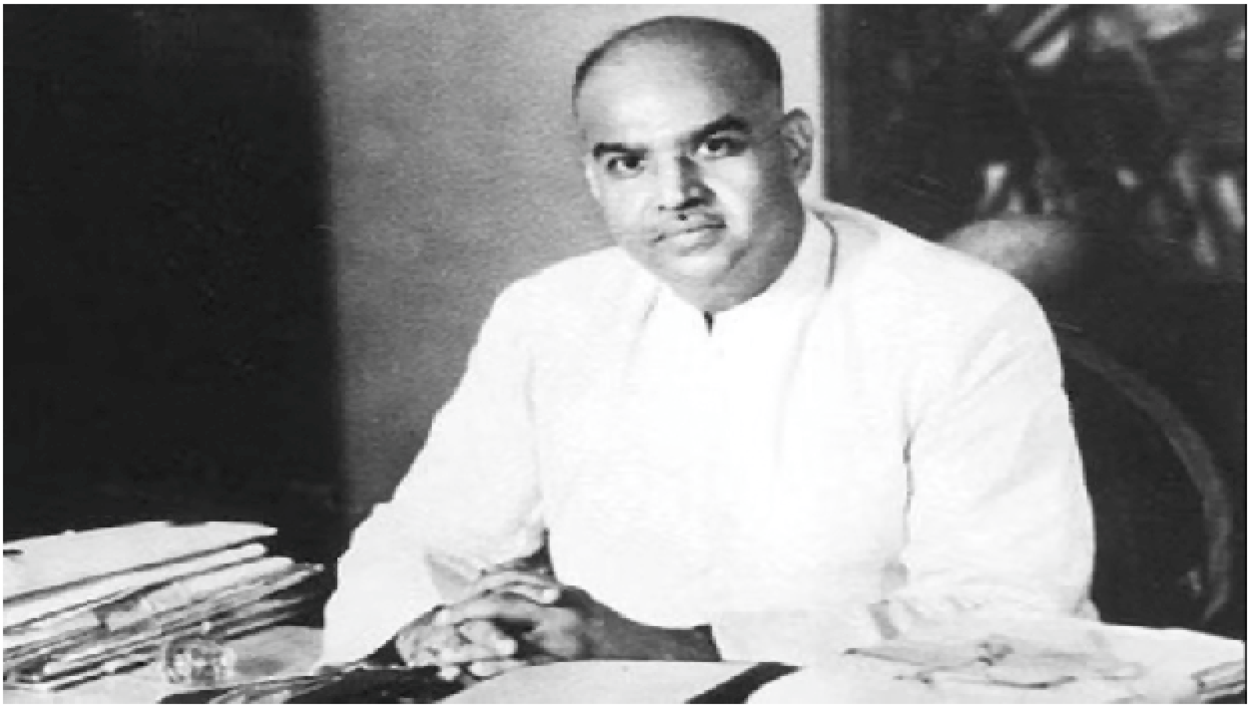

অনন্য ব্যক্তিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

দিব্যেন্দু দালাল

স্বাধীনতার পর এই প্রথম। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রথম। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতি সম্মান জানিয়ে মহা সমারোহে সরকারি ভাবে পালিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এতগুলো দিন ধরে এত এত নেতা, এত এত রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে দেয়নি। কিন্তু যার ভাবনা নিয়ে এত আপত্তি তাঁর ভাবনাই অবশেষে গেরুয়া করে দিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবসের প্রাক্কালে তাঁর অসামান্য জীবনের গল্প। এই সংখ্যায় প্রথম কিস্তি।

ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আধুনিক ভারত গঠনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে যথার্থ স্থান প্রাপ্য ছিল, ইতিহাস-লেখকেরা তা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছেন। একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হিসেবে ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি শ্যামাপ্রসাদের অঙ্গীকার ছিল অতুলনীয়। তিনি শুধু ভারতের ইতিহাসেই নয়, জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণেও নিজের অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন। ভারতের জাতীয় অগ্রগতির জন্য তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিজের কথাতেই প্রতিফলিত হয়েছিল—

"একটি জাতি বেঁচে থাকে বা ধ্বংস হয়ে যায় তার জনগণের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু জনগণের চরিত্র, এবং যে চরিত্রে দেশের যুবসমাজ গড়ে উঠছে, সেটিই শেষ পর্যন্ত একটি জাতির জীবন বা মৃত্যুকে নির্ধারণ করে।"

খুব কম ক্ষেত্রেই ভারত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো এমন একজন নেতাকে দেখেছে, যিনি রাজনীতি, নীতিনির্ধারণ, জাতীয় স্বার্থ, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদসহ বহু ক্ষেত্রে নিজের অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন। যাঁরা তাঁর জীবন ও কর্মকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা একমত হবেন যে আধুনিক ভারত গঠনে শ্যামাপ্রসাদের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু সমাজের কণ্ঠস্বরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুসলিম লীগের বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে তিনি চাননি যে হিন্দু মহাসভা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক; বরং তিনি এটিকে সাধারণ মানুষের সেবার একটি বৃহত্তর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রথমদিকে

ভারতের বিভাজনের দৃঢ় বিরোধী ছিলেন। তবে ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাব ও বাংলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি দেশভাগকে সমর্থন করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'বৃহত্তর পাকিস্তান'-এর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন, যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ছিল।

মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে শ্যামাপ্রসাদ জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেন। তাঁকে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী করা হয়। শিল্পমন্ত্রী হিসেবে মু মুখার্জি ভারতের শিল্পায়নের প্রথম বীজ বপন করেন। তিনি ভারতের শিল্পনীতির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের জন্য মজবুত ভূমি প্রস্তুত করেন। তাঁর মন্ত্রিত্বকালেই অল-ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফ্টস বোর্ড, অল-ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ড, সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ড, টেক্সটাইল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক নির্যাতনের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নেহরু তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে নয়াদিল্লিতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান, যার ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালে দিল্লি চুক্তি (নেহরু-লিয়াকত চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই চুক্তিতে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন ও সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু মুখার্জি এই আমন্ত্রণ ও সরকারের পাকিস্তান-নীতি সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানান এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

হিন্দুর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আধুনিক হিন্দুত্ববাদের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি হিন্দুত্বকে জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করার একটি মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তাঁর মতে, এটি ভারতের সমৃদ্ধ সভ্যতা ও পবিত্র সংস্কৃতির উৎস, যা বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা বহন করে। ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘ (বিজেএস) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বকে সাংগঠিক রূপ দেন। পরবর্তীকালে এই জনসংঘই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে রূপান্তরিত হয়।

হিন্দুত্ব, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি ছিল ভারতীয় জনসংঘের মূল ভিত্তি।

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তার সঙ্গে জাতীয় আত্মচেতনার উপলব্ধি যুক্ত হয়।"

জনসংঘের প্রথম সংকল্পপত্রে এই বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছিল। জনসংঘের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ ভারতে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ধারার সূচনা করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসংঘ ছিল প্রথম প্রকৃত বিরোধী শক্তি। ১৯৫১ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনসংঘ মাত্র তিনজন সদস্যকে, যার মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও ছিলেন, প্রথম লোকসভায় পাঠাতে সক্ষম হয়। পরে জনসংঘ অন্যান্য ছোট দলগুলির সঙ্গে মিলে সংসদে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এনডিপি) গঠন করে এবং শ্যামাপ্রসাদ সর্বসম্মতিক্রমে এর নেতা নির্বাচিত হন। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার জন্য তিনি "সংসদের

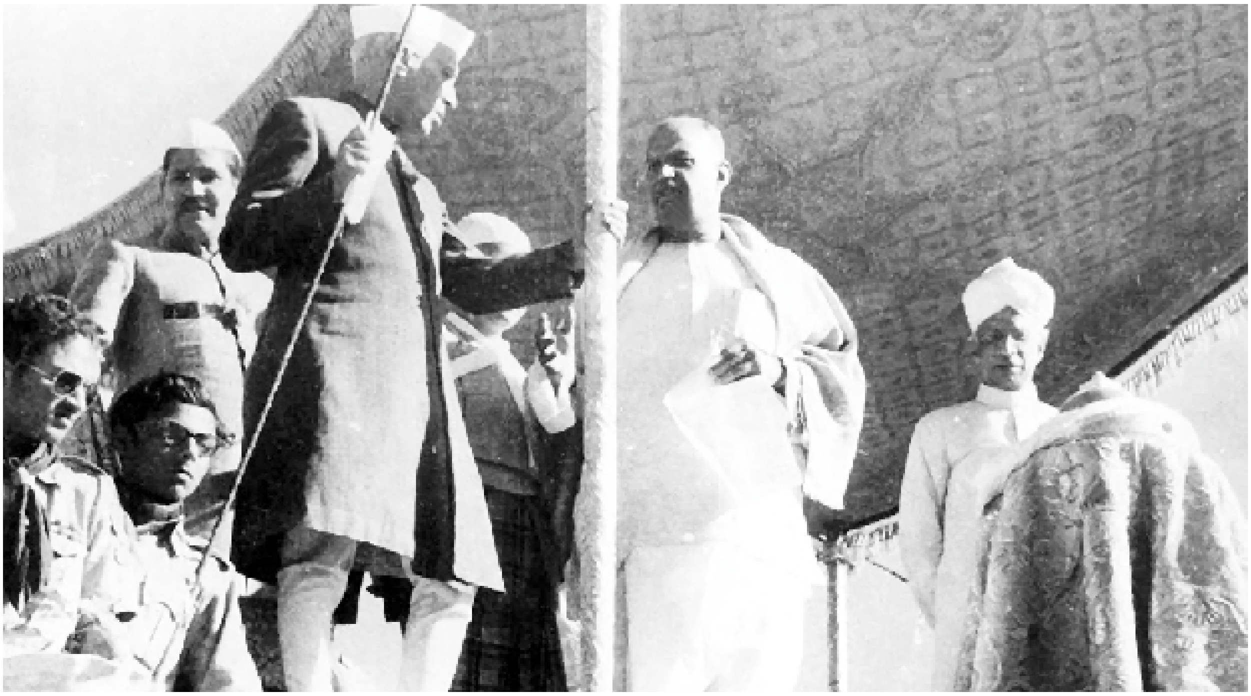

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

সিংহ” উপাধি অর্জন করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের একীভূতকরণে শ্যামাপ্রসাদ

জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে একীভূত করার আন্দোলনের জন্যও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর বিখ্যাত স্লোগান ছিল—

“এক দেশে দুই প্রধানমন্ত্রী, দুই সংবিধান, দুই জাতীয় পতাকা চলবে না, চলবে না।”

এই স্লোগানের মাধ্যমে তিনি একটি শক্তিশালী গণআন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করার দাবি তুলেছিলেন এবং ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি বিখ্যাত “এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান” আন্দোলনের সূচনা করেন। জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

যাত্রা, বেআইনি আটক এবং মৃত্যু

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও তাঁর সহযাত্রীরা ১৯৫৩ সালের ৮ই মে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে জম্মুর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ড. মুখার্জির সঙ্গে তাঁর সহযোগী গুরু দত্ত বৈদ, অটল বিহারী বাজপেয়ী, টেক চাঁদ, বলরাজ মাধোক এবং কয়েকজন সাংবাদিকও জম্মু ও কাশ্মীরে যাচ্ছিলেন।

তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার মাধ্যমে কাশ্মীরকে নিজস্ব পতাকা ও নিজস্ব প্রধানমন্ত্রীসহ বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ড. মুখার্জি বলেছিলেন, “এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান এবং দুই নিশান চলবে না।” পরবর্তীকালে এই স্লোগান নেহরুর কাশ্মীরনীতি বিরোধী বহু জাতীয়তাবাদীর সংগ্রামের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে।

তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করার পর ১১ই মে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই শেখ আবদুল্লাহ-নেতৃত্বাধীন সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাঁকে একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়। শ্রীনগর শহর থেকে অনেক দূরে, নিশাত বাগের কাছে প্রায় জনমানবশূন্য এলাকায় একটি ছোট কুটিরকে উপ-কারাগারে রূপান্তরিত করে সেখানে তাঁকে আটক রাখা হয়। স্থানটি ছিল ডাল লেকের পাশের পর্বতমালার ঢালে অবস্থিত।

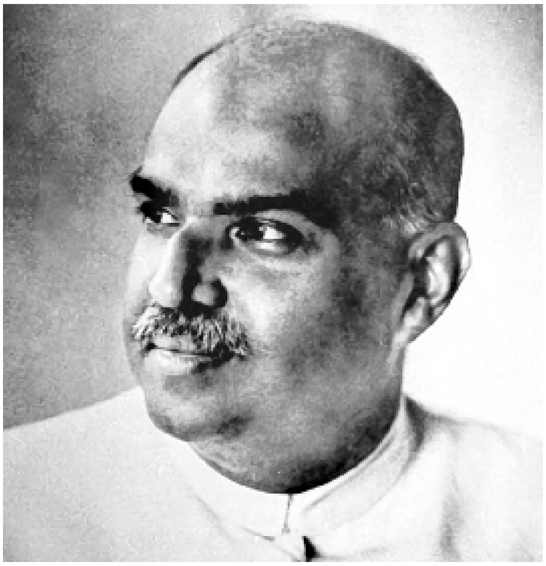

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

উল্লেখযোগ্য যে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দীর্ঘদিন ধরে শুকনো প্লুরিসি (Dry Pleurisy) এবং অন্যান্য হৃদ্রোগজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। এই শারীরিক সমস্যাগুলি থাকা সত্ত্বেও শেখ আবদুল্লাহ-নেতৃত্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীর সরকার তাঁকে একজন সাধারণ অপরাধীর মতো আচরণ করে শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত একটি পুরোনো অতিথিশালায় বন্দি করে রাখে।

আশ্চর্যের বিষয়, তাঁকে এমন একটি স্থানে রাখা হয়েছিল যেখানে পৌঁছানোই ছিল অত্যন্ত কঠিন। সেই কুটির-রূপান্তরিত কারাগারে পৌঁছাতে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো। প্রশ্ন জাগে, গুরুতর পায়ের আঘাতে ভোগা ড. মুখার্জিকে কেন এমন দুর্গম স্থানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

তথাগত রায় তাঁর “Shyama Prasad Mookerjee: His Life and Times” গ্রন্থে, যা জনসংঘ নেতার একটি জীবনী, উল্লেখ করেছেন যে জুন মাসের শুরুতে ড. মুখার্জীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্দেহজনক-ভাবে অবনতি হতে শুরু করে। ২০ জুন বিকেল প্রায় ৩টা ৩০ মিনিটে তাঁকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin) দেওয়া হয়, যদিও তিনি চিকিৎসকদের জানিয়েছিলেন যে এই ওষুধে তাঁর অ্যালার্জি রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসক ড. মোহাম্মদ জানান যে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা অনেক পুরনো, এবং এই ওষুধ সম্পর্কে “অনেক নতুন তথ্য” জানা গেছে বলে দাবি করেন। ওষুধটির নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করে তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগ করেন এবং বলেন যে তাঁর উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এছাড়াও তাঁকে একটি গুঁড়ো ওষুধ দেওয়া হয়, যা ব্যথানাশক বলে দাবি করা হয়েছিল। চিকিৎসকেরা ড. মুখার্জিকে ব্যথা থাকা পর্যন্ত দিনে দু'বার সেই ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। গুরু দত্ত বৈদের বর্ণনা অনুযায়ী, ড. মুখার্জি কারাগারের সুপারিন্টেনডেন্টকে তাঁর অসুস্থতার খবর আত্মীয়স্বজনদের জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কোনো বার্তা পাঠানো হয়নি, এমনকি তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকেও কোনো স্বাস্থ্য-বুলেটিন প্রকাশ করা হয়নি।

পরের দিন শুধুমাত্র জেলের চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেন; যেসব চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁকে দেখতে যাননি। জেলের চিকিৎসক তাঁকে আরও এক গ্রাম স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেন, যার ফলে সারাদিন তাঁর জ্বর ও ব্যথা আরও বেড়ে যায়।

(শেষ কিস্তি পরবর্তী সংখ্যায়)।

রাজ্যে চালু হল অন্নপূর্ণা ভান্ডার

কথা রাখলো বিজেপি সরকার

সোমনাথ গোস্বামী

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সেই অর্থে শুধুমাত্র একটি জনকল্যাণ প্রকল্প নয়; এটি প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী ব্যবধান কমিয়ে আনার একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্শনের প্রতিফলন। যোগ্য মানুষের হাতে তাঁর প্রাপ্য অধিকার পৌঁছে দেওয়া এবং অযোগ্য মানুষের হাত থেকে জনসাধারণের অর্থকে রক্ষা করা— এই দুইয়ের সমন্বয়ই সুশাসনের প্রকৃত পরীক্ষা।

মাসে ৩,০০০ টাকা কোনও পরিবারের অর্থনীতি বদলে দেয় কি না, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু সেই অর্থ যখন সরাসরি একজন মহিলার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে, তখন সংসারের খরচ, সন্তানের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য কিংবা সঞ্চয় সম্পর্কে তাঁর মতের গুরুত্ব যে বাড়ে, তা নিয়ে বিতর্কের খুব বেশি অবকাশ নেই। অর্থনীতির ইতিহাস বলছে, মহিলাদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা যত বেড়েছে, পরিবারের মানবসম্পদ তত শক্তিশালী হয়েছে। সেই কারণেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারকে কেবল একটি নগদ সহায়তা প্রকল্প হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি মূলত নারীকে পরিবারের প্রান্তিক সদস্য থেকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে নিয়ে আসার একটি প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এই প্রকল্প সেই বৃহত্তর দর্শনেরই প্রতিফলন— যেখানে নারীকে সাহায্যের গ্রহীতা নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নির্বাচনের আগে সংকল্পপত্রে একটি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যোগ্য মহিলাদের আর্থিক সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করা হবে এবং পূর্ববর্তী প্রকল্পের তুলনায় নগদ সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে মাসিক ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করা হবে। সরকার গঠনের পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম পর্যায়ে ২৮,২৫,৭৬৯ জন মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩,০০০ টাকা জমা পড়েছে। অর্থাৎ মাত্র একদিনেই ৮৪৭ কোটিরও বেশি টাকা সরাসরি মহিলাদের হাতে পৌঁছেছে। মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়া, সুপারিশ ছাড়া এবং নগদ বন্টনের পুরনো দুর্বলতা ছাড়া। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে প্রশাসনিক বাস্তবায়নের এই দ্রুত রূপান্তরই নতুন ব্যবস্থার প্রথম বড় সাফল্য।

তবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের প্রকৃত তাৎপর্য ভাতার অঙ্কে নয়; এর তাৎপর্য উপভোক্তা নির্বাচনের পদ্ধতিতে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সবসময়ই ছিল— সরকারি অর্থ কি প্রকৃত প্রাপকের হাতে পৌঁছচ্ছে? নতুন সরকার সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বৃহৎ যাচাই অভিযান চালায়। আধার সংযুক্তি, ব্যাঙ্ক তথ্যের মিলন, পরিবারভিত্তিক যাচাই এবং ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপভোক্তা তালিকা পুনর্বিন্যাস করা হয়। সরকারি যাচাই

অভিযানে ৩০ লক্ষ অযোগ্য উপভোক্তার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, ফলে বহু বছরের আর্থিক অপচয়ের একটি বড় উৎস বন্ধ হয়েছে। এই পদক্ষেপের অর্থ শুধু কয়েকটি নাম বাদ দেওয়া নয়; এর অর্থ করদাতার অর্থকে প্রকৃত উপভোক্তার জন্য সংরক্ষণ করা। জনকল্যাণ তখনই কার্যকর হয়, যখন তার প্রতিটি টাকা সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছয়।

এই একটি পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বুঝতে হলে বিষয়টিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। কোনও কল্যাণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য কখনও তালিকা বড় করা নয়; উদ্দেশ্য হল সঠিক মানুষকে সঠিক সুবিধা দেওয়া। অতীতে বহু প্রকল্পে এমন অভিযোগ উঠেছে যে প্রকৃত প্রাপকের পাশাপাশি অযোগ্য ব্যক্তিরাও সুবিধা পেয়েছেন। ফলে সরকারি ব্যয়ের একটি অংশ তার নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। নতুন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট— যোগ্য প্রত্যেকে পাবেন, কিন্তু অযোগ্য কেউ পাবেন না। কারণ একজন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পৌঁছনো সরকারি অর্থ শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও যোগ্য মহিলার প্রাপ্য অংশ কমিয়ে দেয়। তাই উপভোক্তা তালিকার শুদ্ধিকরণ কোনও প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

নারী ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এই প্রকল্পের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মহিলাদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছলে সেই অর্থের বড় অংশ ব্যয় হয় খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এই ব্যয় শুধু বর্তমান ভোগের জন্য নয়; ভবিষ্যতের মানবসম্পদ গঠনের সঙ্গেও যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মহিলা এখনও অনিয়মিত আয়, কৃষিনির্ভর পরিবার বা স্বল্প আয়ের সংসারের অংশ। তাঁদের জন্য মাসিক ৩,০০০ টাকা মানে শুধুমাত্র কিছু অতিরিক্ত অর্থ নয়; অনেক ক্ষেত্রে এটি ওষুধ কেনার নিশ্চয়তা, মেয়ের পড়াশোনার খরচ, জরুরি সঞ্চয় কিংবা ঋণের চাপ কমানোর সুযোগ। অর্থনীতির ভাষায় একে সামাজিক সুরক্ষা বলা হয়; সাধারণ মানুষের ভাষায় একে বলা যায় মানসিক স্বস্তি।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ভুল হবে। এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির একটি বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ। কয়েক বছর আগেও বহু মহিলার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না অথবা থাকলেও তা সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হত না। আজ লক্ষ লক্ষ মহিলা সরাসরি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। সরকারি সহায়তা তাঁদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। এই পরিবর্তন ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর সামাজিক প্রভাব গভীর।

কারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রথম ধাপ হল নিজের নামে অর্থ গ্রহণ এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। যখন কোনও মহিলা নিজের অ্যাকাউন্টে জমা পড়া অর্থ সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন, তখন ক্ষমতায়নের একটি নতুন পরিসর তৈরি হয়।

অবশ্যই একটি উন্নত সমাজ শুধুমাত্র ভাতার উপর দাঁড়াতে পারে না। কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি সমান গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সরকার সেই দিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের ফল সবার কাছে একই গতিতে পৌঁছয় না। শিল্প প্রকল্পের সুফল পৌঁছতে সময় লাগে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতেও সময় লাগে। সেই অন্তর্বর্তী সময়ে সমাজের দুর্বল অংশকে সুরক্ষা দেওয়াই একটি দায়িত্বশীল সরকারের কাজ। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সেই সুরক্ষা বলয়কে আরও শক্তিশালী করেছে। একদিকে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ভিত্তি গড়ে তোলা, অন্যদিকে প্রান্তিক মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা— এই দুই পথ পরস্পরের বিকল্প নয়; বরং পরিপূরক।

রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি নতুন নয়। প্রতিটি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো হয়, মানুষের প্রত্যাশাকে স্পর্শ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয় নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে। কারণ ভোটের আগে বলা কথা আর ভোটের পরে করা কাজ— এই দুইয়ের মধ্যকার দূরত্বই শেষ পর্যন্ত কোনও সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করে। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সেই অর্থে শুধুমাত্র একটি জনকল্যাণ প্রকল্প নয়; এটি প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী ব্যবধান কমিয়ে আনার একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্শনের প্রতিফলন। যোগ্য মানুষের হাতে তাঁর প্রাপ্য অধিকার পৌঁছে দেওয়া এবং অযোগ্য মানুষের হাত থেকে জনসাধারণের অর্থকে রক্ষা করা— এই দুইয়ের সমন্বয়ই সুশাসনের প্রকৃত পরীক্ষা। কারণ সরকারি কোষাগারের প্রতিটি টাকার উৎস শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পরিশ্রম, কর এবং অবদান। সেই অর্থের প্রতি দায়বদ্ধতাই একটি দায়িত্বশীল সরকারের প্রথম কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ আজ সেই দায়বদ্ধতার এক নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সাফল্য শুধু কত লক্ষ মহিলা টাকা পেলেন, সেই পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়; এর সাফল্য নিহিত রয়েছে এই বার্তায় যে সরকার মানুষের দরজায় শুধু প্রতিশ্রুতি নিয়ে যায়নি, প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপও পৌঁছে দিয়েছে। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত মনে রাখে না কে কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; ইতিহাস মনে রাখে কে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিল।

বাংলার উন্নয়ন
বিজেপি সরকারের অঙ্গীকার
বিজেপি
বিজেপি সরকার আসতেই ৬ বছরের জট কাটিয়ে চিংড়িঘাটায় থেমে থাকা ৬২ মিটারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
পিলারের কাজ শেষ হতেই শুরু হয়েছে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের প্রধান প্রবেশপথ নির্মাণ।
কথায় নয়, কাজেই প্রমাণ-উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে বাংলা
/BJP4Bengal bjpbengal.org

ককরোচ জনতা পার্টি
ডিপ স্টেটের আরেকটি চাল

গৌতম ঘোষ

এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক পরিচিত বিজেপি বিরোধী মুখও প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। মহুয়া মৈত্র থেকে ধ্রুব রাঠি—অনেকেই এটিকে যুবসমাজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমালোচকদের প্রশ্ন, এই ক্ষোভকে কি সমাধানের পথে পরিচালিত করা হচ্ছে, নাকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে?

প্রশ্নটা হলো—ভারতের যুবসমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের লড়াই চলছে, নাকি তাদের আবেগকে ব্যবহার করে আরেকটি রাজনৈতিক পরীক্ষাগার তৈরি করা হচ্ছে?

ভারতের রাজনীতিতে গত কয়েক বছরে একটি বিষয় বারবার প্রমাণিত হয়েছে—সোশ্যাল মিডিয়া এখন শুধু মত প্রকাশের মাধ্যম নয়, এটি জনমত গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। একটি হ্যাশট্যাগ, একটি ভাইরাল ভিডিও বা একটি আবেগঘন পোস্ট কয়েক ঘন্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু সেই জনমত কি সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত? নাকি তার পেছনেও থাকে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল?

২০২৬ সালের ১৫ মে ভারতের প্রধান বিচারপতি মাননীয় সূর্যকান্ত একটি পর্যবেক্ষণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত সমালোচনায় মগ্ন কিছু মানুষের আচরণ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, অনেকেই কর্মহীন অবস্থায় সারাদিন অন্যের ভুল খুঁজে বেড়ান এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে শুধুমাত্র সমালোচনার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। মন্তব্যটি ছিল একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে।

নয়াদিল্লিতে আরশোলাদের ফ্লপ শো।

কিন্তু ঠিক পরদিন, ১৬ মে, দেখা গেল এক নতুন ডিজিটাল আন্দোলনের উত্থান—"ককরোচ জনতা পার্টি"। এর অন্যতম মুখ অভিজিৎ দীপকে সামাজিক মাধ্যমে আহ্বান জানালেন, যুবসমাজকে অপমান করা হয়েছে এবং সেই অপমানের জবাব দিতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে "আমরাই ককরোচ" স্লোগান ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার মানুষ নিজেদের সেই পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

এখানেই প্রথম প্রশ্ন।

যদি এই আন্দোলন শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের বিরুদ্ধে হয়, তাহলে বিজেপিকে আনফলো করার আহ্বান কেন দেওয়া হলো? প্রধান বিচারপতি কি বিজেপির সদস্য? ভারতের বিচারব্যবস্থা কি কোনো রাজনৈতিক দলের অংশ? যদি না হয়, তাহলে একটি বিচারিক পর্যবেক্ষণ কীভাবে হঠাৎ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারে রূপান্তরিত হলো?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাই জরুরি।

অভিজিৎ দীপকে একজন রাজনৈতিক যোগাযোগ কৌশলবিদ হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রচারে তাঁর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সমালোচকদের মতে, তিনি খুব ভালো করেই জানেন কীভাবে একটি বক্তব্যকে আবেগের কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তায় রূপান্তর করা যায়। ফলে অনেকের কাছেই এই আন্দোলন শুধুমাত্র একটি মিম-ভিত্তিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরির প্রচেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে।

ইতিহাসে আমরা দেখেছি, অসন্তোষকে সংগঠিত করা রাজনীতির একটি কার্যকর কৌশল। বেকারত্ব, হতাশা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা—এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা কিংবা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সামাজিক মাধ্যমের শক্তিকে অবহেলা করা যায় না।

ভারতের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠছে—এই তথাকথিত "ককরোচ জনতা পার্টি" কি শুধুই ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ, নাকি এর পেছনে বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে?

আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক পরিচিত বিজেপি বিরোধী মুখও প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। মহুয়া মৈত্র থেকে ধ্রুব রাঠি—অনেকেই এটিকে যুবসমাজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমালোচকদের প্রশ্ন, এই ক্ষোভকে কি সমাধানের পথে পরিচালিত করা হচ্ছে, নাকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে?

আজকের ভারত সেই ভারত নয়, যাকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়। আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও ভারত অর্থনৈতিকভাবে এগিয়েছে, সীমান্ত সুরক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে ভারতের অগ্রযাত্রাকে থামানোর জন্য নতুন নতুন ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা হবে—এমন আশঙ্কা অনেকেই প্রকাশ করছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তথ্য ও প্রচারণার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। শুধুমাত্র ক্ষোভ, ব্যঙ্গ বা ভাইরাল ট্রেন্ড কোনো জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে না। একটি দেশ এগোয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবন, পরিশ্রম এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমে।

তাই আজ প্রয়োজন আবেগের সঙ্গে যুক্তিরও। প্রয়োজন প্রশ্ন করার—আমরা কি সত্যিই পরিবর্তনের জন্য লড়ছি, নাকি কারও রাজনৈতিক পরীক্ষার অংশ হয়ে উঠছি? আমরা কি দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছি, নাকি ডিজিটাল উত্তেজনার ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছি?

ভারতের যুবসমাজ দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই শক্তি যদি রাষ্ট্রগঠন, সমাজসেবা, উদ্যোগ ও উন্নয়নের পথে ব্যবহার হয়, তাহলে ভারতকে থামানো অসম্ভব। কিন্তু যদি সেই শক্তি শুধুমাত্র হতাশা ও বিভাজনের রাজনীতির ইন্ধন হয়ে ওঠে, তাহলে ক্ষতি হবে দেশেরই।

সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন, প্রশ্ন করুন। কারণ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, প্রতিটি নাগরিকের। আর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডে নয়, দেশের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষের কর্মে।

নৌসেনার জন্য আসছে
অত্যাধুনিক
জ্যামার!
সামুদ্রিক যুদ্ধক্ষমতা শক্তিশালী করতে
২০টি ECGNSS জ্যামার কিনছে ভারত
বরাদ্দ হলো ৪৪৯ কোটি টাকা
শত্রুপক্ষের GNSS রিসিভারের স্যাটেলাইট
সিগন্যাল গ্রহণ ও ট্র্যাকিং ক্ষমতা ব্যাহত
করতে পারবে এই জ্যামার
বিজেপি
শক্তিশালী হচ্ছে নৌসেনা,
ঘুম উড়ছে শত্রুপক্ষের!
/BJP4Bengal bjpbengal.org

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা

পূর্ণমন্ত্রী

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর; ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর; বিদ্যুৎ দফতর; তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর ; কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর এবং অন্য কোনও মন্ত্রীকে বণ্টন না করা বাকি সমস্ত দফতর।

দিলীপ ঘোষ
পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতর এবং কৃষি বিপণন দফতর।

অগ্নিমিত্রা পাল
নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর।

অশোক কীর্তনিয়া
খাদ্য ও সরবরাহ দফতর এবং সমবায় দফতর।

ক্ষুদিরাম টুডু
আদিবাসী উন্নয়ন দফতর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর।

নিশীথ প্রামানিক
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতর।

তাপস রায়
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দফতর; গণপূর্ত দফতর এবং অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দফতর।

মনোজ ওরাওঁ
বন দফতর এবং পরিবেশ দফতর।

অর্জুন সিং
শ্রম দফতর এবং পরিবহণ দফতর।

গৌরীশঙ্কর ঘোষ
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতর এবং গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর।

দীপক বর্মণ
বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর; আবাসন দফতর এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দফতর।

শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর।

অরূপকুমার দাস
সেচ ও জলপথ দফতর।

স্বপন দাশগুপ্ত
অর্থ দফতর।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
উচ্চশিক্ষা দফতর এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতর।

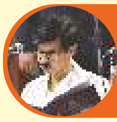

কল্যাণ চক্রবর্তী
তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দফতর; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি দফতর এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতর।

শঙ্কর ঘোষ
সংসদীয় বিষয়ক দফতর এবং পর্যটন দফতর।

অজয় পোদ্দার
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর এবং পূর্ত দফতর।

দুধকুমার মণ্ডল
কৃষি দফতর।

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

মালতি রাভা রায়
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দফতর; স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতর এবং কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ দফতর।

রাজেশ মাহাতো
প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর এবং মৎস্য চাষ দফতর।

ইন্দ্রনীল খাঁ
যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর এবং ক্রেতা সুরক্ষা দফতর।

প্রতিমন্ত্রী

অশোক দিন্দা

কৃষি বিপণন দফতর এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দফতর।

কৌশিক চৌধুরী

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এবং দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতর।

জুয়েল মুর্মু

আদিবাসী উন্নয়ন দফতর এবং সেচ ও জলপথ দফতর।

হরেকৃষ্ণ বেরা

উচ্চশিক্ষা দফতর এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতর।

শান্তনু প্রামাণিক

খাদ্য ও সরবরাহ দফতর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতর।

মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দফতর এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি দফতর।

উমেশ রাই

সংসদীয় বিষয়ক দফতর এবং নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর।

পূর্ণিমা চক্রবর্তী

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর এবং পর্যটন দফতর।

ভাস্কর ভট্টাচার্য

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর এবং শ্রম দফতর।

দিবাকর ঘরামি

সমবায় দফতর; বন দফতর এবং পরিবেশ দফতর।

নাদিয়ারচাঁদ বাউড়ি

পূর্ত দফতর এবং অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতর।

গার্গী দাস ঘোষ

বিদ্যুৎ দফতর এবং অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দফতর।

অমিয় কিস্কু

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতর এবং কৃষি দফতর।

কলিতা মাজি

আবাসন দফতর।

বিরাজ বিশ্বাস

আইন দফতর; বিচার বিভাগীয় দফতর এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর।

সুমনা সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর।

আনন্দময় বর্মণ

পরিবহণ দফতর এবং অর্থ দফতর।

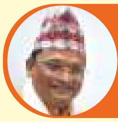

বিশাল লামা

স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর।

দীপঙ্কর জানা

ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর এবং সুন্দরবন বিষয়ক দফতর।

নয়াদিল্লি ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত এনডিএ বৈঠকের বিরতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি,
মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ সকল নেতৃবৃন্দের একসঙ্গে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝালমুড়ি উপভোগ।

'অতুলনীয় ১২ বছর'। ভারতের 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের যুগপূর্তিতে ভারত মণ্ডপমে এনডিএ-র সমাবেশ।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।